সুভাষ চন্দ্র বোস নেই, নেতাজি আছেন : ১২৫তম জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

আমাদের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র বোস (১৮৯৭-১৯৮৫) হয়তো নেই কিন্তু নেতাজি আছেন, কাজের মধ্য দিয়ে, দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তিনি শুধু বাঙালি বা ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে সশস্ত্র সংগ্রামের বিমূর্ত প্রতীক হিসাবে অমরত্ব লাভ করেছেন। গান্ধীবাদি অহিংস জাতীয় সংগ্রামের এক বিকল্প পথ হিসেবে সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের ডাক দিয়ে তিনি ভারতের কোটি কোটি তরুণের স্বপ্নে থেকে গেছেন। তিনি শুধু পথের ভাবনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, দেখিয়েছেন কিভাবে অসীম বীরত্বের মধ্য দিয়ে সেই পথে স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। কংগ্রেস-রাজনীতির আভ্যন্তরীণ কাঠামো, তার মত ও পথের সঙ্গে না মেলায় নেতাজি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে গোপনে বিদেশে পাড়ি দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তথা আই.এন.এ গঠন করে তার দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর বিদেশে যাওয়ার কাহিনি, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন নিয়ে রোমাঞ্চকর সব কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের জগতে তার রাজনীতিক মতাদর্শ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে; তিনি কেমন সমাজতন্ত্রী ছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক হয়েছে; ফলে কমিউনিস্টদের নিন্দার শিকার হয়েছেন। এই প্রবন্ধে আমি সেইসব নিয়ে তর্কে অংশগ্রহণ করব না। আমি প্রশ্ন তুলব সত্যিই কি নেতাজি ১৯৪৫ সালের বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন। নাকি গুমনামি বাবার ছদ্মবেশে ফৈজাবাদে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় তাই নেতাজির মৃত্যু রহস্য, কোনো মনগড়া কাহিনি নয়। জাস্টিস্ মুখার্জী কমিশনের (২০০৫) দেওয়া তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

নেতাজির মৃত্যু নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মৃত্যুর দিন ও

Scanned by CamScanner

স্থান নিয়ে মোটামুটিভাবে পাঁচটি মতো কমিশন খুঁজে পেয়েছে। সেই পাঁচটি মতের বিস্তারিত তথ্য পরিবেশনের আগে সাল তারিখ অনুযায়ী যেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে :

১) ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় নেতাজিকে হত্যা করা হয়;

২) ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাওয়ানের (অতীতের ফারমোসা) তাইহোকু-র বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হোন;

৩) ১৯৭৭ সালে তিনি উত্তরপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরাঞ্চল) দেরাদুনে মারা যান;

৪) ১৯৭৭ সালের ২১ মে তিনি মধ্যপ্রদেশের সেওপুরকালান-এ মারা যান;

৫) ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে রামভবনে তিনি মারা যান।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে মৃত্যুর কোন দিন ও স্থান সম্পর্কে সংশয় না থাকলে এই পাঁচটি তারিখ ও স্থানের উল্লেখের প্রয়োজন হতো না। আবার এটাও ঠিক যে কোনো তারিখই যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে নেতাজি মারা যাননি। তবে ভারতীয়দের গড় আয়ু ৭০-৭৫ বছর ধরে এবং নেতাজির জন্ম ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ (প্রশ্নাতীত) ধরলে এখন তাঁর বয়স ১২৪ বছর হবে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় এখন সুভাষচন্দ্র বোস, জাপানিদের 'চন্দ্র বোস' এখন বেঁচে নেই। তবে কমিশনের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে অনেক সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ বলেছেন যে তিনি এখনও বেঁচে আছেন কারণ ২০০০ খ্রিস্টাব্দে একজন সাধু ১২৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কেউ একশো বছরের অধিক সময় বেঁচে থাকাটা সম্ভবপর, কিন্তু তা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ব্যতিক্রমী হিসেবে অবশ্য তা ঘটতেই পারে। যেহেতু নেতাজির মৃত্যু নিয়ে সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেননি, শুধু সেগুলি কিছু বৈধ অনুমান আমরা এখন ধরে নিতে পারি যে তিনি বেঁচে নেই।

লালকেল্লায় মৃত্যু :

কলকাতার এক বাসিন্দা শ্রী উষারঞ্জন ভট্টাচার্য এক হলফনামা কমিশনের কাছে জমা দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাত্রি বারোটায় লালকেল্লার মধ্যে নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছিল সিরামবানে আজাদহিন্দ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করে দিল্লিতে আনার পর। তাঁকে আনা হয়েছিল সিঙ্গাপুর হয়ে আগের দিন রাত্রে। শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, তাঁকে লালকেল্লার এক গোপন স্থানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল যেখান থেকে এনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন সেখানেই তাঁকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর চিতাভস্ম তৎক্ষণাৎ লালকেল্লায় সমাধিস্থ করা হয়। এই মতের সপক্ষে অবশ্য তিনি কোনো জোরালো প্রমাণ কমিশনের কাছে হাজির করতে পারেননি। একমাত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে তাঁর নিজেরই এক লেখা বই 'নেতাজিকে লালকেল্লায় হত্যা' যেখানে বিস্তারিত তিনি বলেছেন কিভাবে নেতাজিকে লালকেল্লায় হত্যা করা হয়েছিল এবং যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর জ্ঞানের তথ্য কি তার উত্তরে শুধু বলেন প্রবল সম্ভাবনা ও অনুমান। কোনো তথ্য দিতে না পারায় তাঁর এই মতকে নিছক ব্যক্তিগত কল্পনা বলে কমিশন তা খারিজ করে দেয়।

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু :

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর খবরটি যেহেতু জাপান রেডিও থেকে ১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্ট ঘোষণা করা হয় তা ভারত তো বটেই অন্য দেশের সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইংরেজ, চীনা ও জাপানি সরকারের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালানো হয়। অনেক পরে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫৬ সালে তিন-সদস্যের কমিটি এবং ১৯৭০ সালে এক-সদস্যের কমিশন গঠন করা হয়। দুটি সংস্থা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ছিল বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তত্ত্বটিকে মেনে নেওয়া। পূর্ববর্তী মতকে গ্রহণ করেও নিঃসংশয় হবার জন্য ভারত সরকার আবার ১৯৯৯ সালে জাস্টিস মুখার্জী কমিশন গঠন করে। অনেকদিন পরে এই কমিশন গঠন করার ফলে একজন বাদে বাকি নেতাজির সহযোদ্ধারা কেউ আর জীবিত ছিলেন না, যাদের সাক্ষ্য নিয়ে সত্যতা যাচাই করা যেত। যাইহোক আগের কমিটি ও কমিশনের যে মত তা হল মোটামুটি ভাবে এই রকম :

১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্টের বিকেলে নেতাজি ছিলেন সিঙ্গাপুরে যে সময় জাপান মিত্রশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে। এই খবর শুনে নেতাজি স্বাধীন ভারতের সাময়িক সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। নেতাজি আত্মসমর্পণ করতে চাইলেও তার সহযোদ্ধারা তাকে রাশিয়ার কোনো ভূখণ্ডে পলায়ন করতে অনুরোধ করেন কারণ তারা চাননি নেতাজিকে বন্দি বানানো হোক। এই সিদ্ধান্তের পরেই নেতাজি, কর্ণেল হাবিবুর রহমান, কর্ণেল প্রীতম সিং এবং অন্যান্যরা ওই দিনই অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট ব্যাঙ্ককে আসেন। সেখান থেকে দুটি বোমারু বিমানে চড়ে তার সহযোদ্ধা ও কয়েকজন জাপানি সেনাদের নিয়ে সাইগঁ-র উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে পৌঁছে তাদের জানানো হয় সেই বিমান ফিরে যাবে। তবে নেতাজিকে বলা হয় যে অন্য একটি বোমারু বিমান সেখান থেকে সৈন্য নিয়ে মাঞ্চুরিয়া যাবে বিকেলে। সেই বিমান ম্যানিলা থেকে এসেছিল এবং যাত্রী ও মাল-বোঝাই ছিল। নেতাজিকে জানানো হয় যে তাদের সকলকে স্থান দিতে না পারলেও একটি আসন নেতাজিকে দিতে পারবে। নেতাজি তার সহযোদ্ধাদের ছেড়ে যেতে রাজি নন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল তেরাওচিকে অনুরোধ করেন তার সহযোদ্ধাদের আসন দেওয়ার জন্য। তিনি নেতাজির কথা রাখেননি। আরেকটি আসন অবশ্য দেবার কথা জানানো হয়। নেতাজি আলোচনায় বসেন। তার সহযোদ্ধাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে হাবিবুর রহমানকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সাইগোঁ থেকে বিকেল পাঁচটার সময় সেই বিমান মানচুরিয়া হয়ে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে টোওরেন-এ পৌঁছায়। পরের দিন সকালে, ১৮ আগস্ট, বিমানটি সেখান থেকে রওনা দিয়ে তাইহোকু (ফরমোসা) যায় এবং সেখানে জ্বালানি নিয়ে বেলা ২টা ৩০ মিনিটে পুনরায় উড়ে যায়। ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমান মুখ থুবড়ে পড়ে উড়ান ক্ষেত্রেই এবং জ্বলতে থাকে।

Scanned by CamScanner

বিমান চালক ও জেনারেল শিডেই ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্যান্য বিমান সেবক, নেতাজি ও তাঁর সহযোদ্ধারা সেই জ্বলন্ত বিমান থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসেন। নেতাজি ও সহ-বিমান চালক মারাত্মকভাবে জখম হোন। তাঁদেরকে নিকটবর্তী সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই রাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়। হাবিবুর রহমান স্বল্প আহত হন। এক বা দুদিন পর তাইপেই-তে নেতাজিকে দাহ করা হয় এবং তার চিতাভস্ম সংগ্রহ করে রাখা হয়। পরে সেই চিতাভস্ম একটা বাক্সবন্দী করে টোকিও-তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সবশেষে তা স্থানীয় রেনকোজি মন্দিরে সংরক্ষণ করা হয় এবং এখনো সেখানে রয়েছে।

তাঁর সহযোদ্ধা হাবিবুর রহমান ও কিছু জাপানি সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নেতাজির সাইগঁ থেকে ১৯৪৬ সালের ১৭ আগস্ট রাশিয়ার উদ্দেশ্যে বিমানে রওনা দেওয়া নিয়ে কোনো বিতর্কের জায়গা নেই। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে যে তথ্য আগের কমিশন বা কমিটি দিয়েছেন তা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের সুযোগ আছে।

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর সত্যতা যাচাই করণের জন্য কমিশন যে সকল জীবিত ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়েছিলেন তারা হলেন—আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়, ড. (কর্ণেল) লক্ষ্মী সেহেগল (আজাদহিন্দ বাহিনীর ঝাঁসি বাহিনীর অধিনায়িকা), ক্যাপ্টেন বারীন্দ্রকুমার (আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্য), শ্রী প্রণব মুখার্জী (তদানীন্তন ভারতের বিদেশমন্ত্রী), শ্রী কে নটবর সিং (বিদেশ প্রতিমন্ত্রী), ১৯৮৬-১৯৮৯ এবং তখনকার জাপানের বিদেশ মন্ত্রী ডাঃ তানেয়শি ইয়োশিমি। তখনকার তাইপেই-এর সামরিক হাসপাতালের ডাক্তার এবং সেখ হসানুদ্দিন বি. কাপাসী, ব্যাঙ্ককের একজন নাগরিক যার পিতা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ছিলেন এবং নেতাজির আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রী। শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪ সালের ৩০ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় এক লেখায় বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে জোরালো যুক্তি দেন। কমিশন তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো তথ্য প্রমাণ আছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেন যে দেশে ও বিদেশে বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁর গবেষণা থেকে এটা বলা হয়েছে। ড. সেহেগাল বলেছেন যে, "১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয় এবং তাঁর চিতাভস্ম জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রাখা আছে—এটা তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু কমিশন যখন সেই তথ্য যাচাই করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বলেন যে 'আমি ওই বিবৃতি দিইনি। আমি তাইপেই-র দুর্ঘটনাস্থলে ছিলাম না তাই ওই দাবি করতে পারি না। আমি তার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতাম না। তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক, আমি একজন ক্যাপটেন।" বারীন্দ্রকুমার বলেছেন তিনি হাবিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন যার সঙ্গে ১৯৪৫ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে কথা হয়। সেই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন দেখা হবার সময় হবিপুর রহমানের দুটো হাতে ও কানের পাশে পোড়া দাগ দেখিয়েছিলেন।

শ্রী প্রণব মুখার্জী বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন ভারত সরকারের অবস্থান অনুযায়ী রেনকোজি মন্দির থেকে নেতাজির চিতাভস্ম আনার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই অবস্থান অনুযায়ী সেই চিতাভস্ম নেতাজির। তাঁর এই তথ্যের ভিত্তি হল শাহ নওয়াজ কমিটি ও খোলসা কমিশনের রিপোর্ট। এই দুই রিপোর্ট ছাড়া তার কাছে কোনো রিপোর্ট ছিল না। শ্রী কে নটবর সিং ও বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে সমর্থন করেছেন রুডলফ হার্তগ-র লেখা 'দি সাইন অব্ দি টাইগার : সুভাষচন্দ্র বোস এ্যান্ড হিজ ইন্ডিয়ান লেজিওন ইন জার্মানি ১৯৪১-৪৫' যেটির মূল্যায়ন প্রকাশিত হয় ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় এবং যাতে স্পষ্টভাবে লেখা হয় সুভাষচন্দ্র বোস তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই মতের পক্ষে যুক্তি কি? উত্তরে তিনি বিভিন্ন বই ও কমিশনের রিপোর্টের কথা বলেন। এবার আসা যাক ডাঃ তানিয়েসি ইয়োশিমির সাক্ষ্যে। যিনি বলেছিলেন বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল এবং নেতাজি তাতে আঘাত পান। হাসিমুদ্দিন বলেছেন তিনি নেতাজি সম্বন্ধে তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন।

উল্লিখিত সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সম্বন্ধে কারও কোনো নিজস্ব জ্ঞান বা তথ্য নেই অথবা তারা কেউই কোনো তথ্য পেশ করতে পারেননি। তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তি হতে পারে প্রচলিত গল্প, বিশ্বাস বা শাহনওয়াজ কমিটি ও খোলসা কমিশনের রিপোর্ট। তাই তাঁদের বক্তব্যকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, এমনকি নির্ভর করে বলা যায় না যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

বিমান দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে নেতাজির হাসপাতালে চিকিৎসা হওয়া, মৃত্যু ও দাহকার্য নিয়ে এবার ঘটনাক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হবে। ডাঃ ইসোশিমির সাক্ষ্য নিয়েছিলেন শাহনওয়াজ কমিটি, খোস্‌লা কমিশন এবং বর্তমান কমিশন। তিনি ছিলেন নানমন সামরিক হাসপাতালের প্রধান, যেখানে নাকি নেতাজি ও তাঁর সঙ্গীদের চিকিৎসা করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বেলা ২টায় তিনি খবর পান যে একটি সামরিক বিমান দুর্ঘটনা কবলিত এবং অনেক আহত মানুষকে সেখানে পাঠানো হবে। তিনি রোগীদের ভর্তির প্রস্তুতি নেন। তিনটি মোটরে আহতদের আনা হয়। তাঁকে জানানো হয় আহতদের মধ্যে একজন চন্দ্র বোস (জাপানিরা যে নামে নেতাজিকে চিনতেন)। ডাঃ ইয়োশিমি চন্দ্র বোসের চিকিৎসা করেন এবং দেখেন যে তাঁর জখম মারাত্মক—যাকে থার্ড ডিগ্রি জ্বলন বলা হয় এবং বাঁচার তেমন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রথমে চন্দ্র বোসের চিকিৎসা করা হয় এবং পরে বাকিদের। নেতাজির জ্ঞান ছিল সাত-আট ঘন্টা। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার ভেতরে তাঁর অবস্থার অবনতি হয় এবং রাত্রি আটটার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাঃ ইয়োশিমি ফরমোসার সামরিক সদর দপ্তরে জানিয়ে দেন নেতাজি বেঁচে নেই। সামরিক কর্তারা আসেন এবং মৃতদেহ ফর্মালিন ইঞ্জেকশন দেবার নির্দেশ দেন যাতে পচন না ধরে। সেই রাত্রেই ডাক্তার নেতাজির মৃত্যু সংশাপত্র প্রস্তুত করেন যাতে তিনি জাপনি ভাষায় চন্দ্র বোস (কোটা কানা) এবং মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখেন 'থার্ড ডিগ্রি বার্নস'। নেতাজির মৃতদেহ এরপর কফিনবন্দী করে টোকিওর পরিবর্তে তাইহোকুতে পাঠানো হয় কারণ কফিন বড় হওয়ায় বিমানে তোলা সম্ভব ছিল না। শাহ নওয়াজ কমিটিতে দেওয়া সাক্ষ্য অনুযায়ী হবিবুর রহমান বলেন যে বারো জন সৈন্য সহ কফিনটিকে একটি ট্রাকে তোলা হয় এবং তার সামনে গাড়িতে

Scanned by CamScanner

যান মিঃ নাগাতোমো, হবিবুর রহমান এবং মি. নাকামুরা। কফিনটি নিয়ে যাওয়া হয় তাইহোকু সিটি গভর্নমেন্ট ক্রিমেটোরিয়াম-এ যেখানে উল্লিখিত তিন ব্যক্তি ছাড়া ছিলেন একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ও একজন শ্মশানসহায়ক। সবাই চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান। পরে চুল্লির পাশে ধূপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা দেখান তাঁরা। চুল্লি সহায়ক পরের দিন আসতে বলেন। চুল্লির চাবি থাকে কর্ণেল হবিবুর ও মেজর নাগাটোমোর কাছে। পরের দিন তারা দু'জনে নেতাজির চিতাভস্ম আনতে যান। তারা নিজেরাই চাবি দিয়ে চুল্লির দরজা খুলে চিতাভস্ম সংগ্রহ করতে চান। কঙ্কালের আকার তখনও ছিল, কিন্তু পুড়ে যাওয়ায় তা অবিচ্ছিন্ন ছিল না। একটি কাঠের বাক্সে কিছু অস্থি সংগ্রহ করা হয়। বাক্সের ঢাকনা পেরেক দিয়ে বন্ধ করা হয়। তবে মেজর নাগাতোমো নিশ্চিত নন পেরেক চুল্লির কাছে দেওয়া হয়েছিল না মন্দিরে। সেই বাক্স সাদা কাপড়ে ঢেকে গাড়িতে করে নিশি (পশ্চিম হনগানজি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দাহ করার তারিখ ও সময় নিয়ে এবং মৃতদেহের পরিচিতি নিয়ে সংশয় থেকে উল্লিখিত মতকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, নিম্নলিখিত যুক্তিতে :

১) নেতাজির আঘাত নিয়ে, তাঁর চিকিৎসা নিয়ে এবং পরে তাঁর মৃত্যু নিয়ে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কোনো নথি নেই; নেই তাঁর অসুস্থতার কোনো বিবরণ বা বেড নং। এটা সঙ্গতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে ডাক্তার তাঁকে দেখেছেন তিনি নিশ্চয়ই তা মৃত্যু সংশাপত্রে স্বাক্ষর করবেন যেখানে মৃত ব্যক্তির বিবরণ, মৃত্যুর সময় ও তারিখ লিখবেন। সেই মৃতদেহ যে দাহ করা হয়েছে সেই মর্মে এক সংশাপত্রের কপি নিশ্চয়ই হাসপাতালে থাকার কথা।

২) হাসপাতালে থাকাকালীন বা চুল্লিতে দাহ করার আগে নেতাজির কোনো ছবি নেওয়া হল না এবং

৩) নেতাজি এক স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং তাঁকে বিশ্বের নটি দেশে স্বীকৃতি জানানো সত্ত্বেও যার মধ্যে জাপানও ছিল, তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে কোনো সামরিক অভিবাদন জানানো হয়নি যা এক স্বাভাবিক রীতি।

কমিশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা দেখা গেছে যে ১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্টের পর এবং ১৯৫৬ সালের শাহ নওয়াজ কমিটির নিয়োগের আগে ইংরেজ ও আমেরিকান গুপ্তচর সংস্থা থেকে মৃত্যুর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র সাক্ষের উপর নির্ভর করেছিল, প্রাসঙ্গিক তথ্য তারা তাইহোকু এয়ারপোর্ট, সামরিক হাসপাতাল, তাইপেই পৌরসভার হেলথ অ্যান্ড হাইজিন ব্যুরো এবং তাইপেই সিটি ক্রিমেটোরিয়াম থেকে তথ্য সংগ্রহ না করেই অনুসন্ধান রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন। তবে 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার'-র সম্পাদক শ্রী হরিণ শাহ ১৯৪৬ সালের আগস্টের শেষে তাইপেই গিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনটি তথ্য পেশ করেন— (১) নেতাজির মৃত্যু নিয়ে ডাক্তারের মন্তব্য, (২) পুলিশ আধিকারিকের রিপোর্ট, (৩) ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত দাহ সংক্রান্ত সংশাপত্র। মৃত্যু সম্পর্কে ডাক্তারের দেওয়া যে রিপোর্ট তা জাপানি থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করলে যা পাওয়া যায় :

From the Army Hospital
To the Bureau of Health and Hygiene
Date of Report : 21st August, 1945
Certificateion of The Death :
Name of the person : Okara Ichiro meaning big warehouses of food and Ichiro means eldest son)
Sex : Male
Birth : Born in the Meiti 22nd years April 19
Occupation : He was Taiwan Military Goverment Army's obedient Officer
Reson of death : By sickness
Nature of Sickness : Heart-failure
Time of Sickness : 17th August, 1945
Place of death : Army Hospital
The Writers' Certificate;
Dated : 21st August
The name of the doctor : Chhuluta Toyoji
Seal Chentze Siskwan
(Japanese University)

শ্রী শাহ বলেছেন যে পুলিশ রিপোর্ট ওই ডাক্তারের রিপোর্টকেই নিশ্চিত করে। শুধু অতিরিক্ত ছিল দাহ করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত এবং দাহ করার সংশাপত্র। তিনি নিজে করণিককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন নেতাজির পরিচয় গোপন করা হয়েছে, উত্তরে তিনি বলেছেন, এ সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই, তবে জাপানি আধিকারিকের নির্দেশে রাষ্ট্রীয় কারণে তা গোপন রাখা হয়। শাহ ধরে নিয়েছিলেন যে ইচিরো ওকারা আসলে নেতাজিই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ 'Gallant end of Netaji' তে তিনি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে সুদূর কল্পনাতেও এটা প্রমাণ হয় না যে এটা নেতাজির মৃত্যুর সংশাপত্র। আসলে শাহ নিজে সেই তথ্যের যাচাই করে দেখেননি। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সমর গুহ যে তথ্য খোসলা কমিশনের কাছে পেশ করেছিলেন তা এই শাহের দেওয়া তথ্যেরই ফটোকপি। তাদের দেওয়া কোনো তথ্যই এটা প্রমাণ করে না যে ইজিরা ওকুরাই ছিলেন নেতাজি। ফলে বর্তমান কমিশনের দায়িত্ব বেড়ে যায় নেতাজির মৃত্যু রহস্যের উদ্ঘাটন করার।

নেতাজির মৃত্যুর সংশাপত্র দিয়েছিলেন ডাঃ ইয়োশিমি। তিনি চন্দ্র বোসের নামে সেই সংশাপত্র দিয়েছিলেন যা জাপানি ভাষায় কাটাকানা। তিনি সুভাষচন্দ্র বোসকে চিনতেন না। সামরিক আধিকারিক তাকে সুভাষ বোসের কথা বলেননি, শুধু লিখতে বলেছিলেন কাটাকানা। আধিকারিক এই সংশাপত্র প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। সেই সংশাপত্র সেই আধিকারিকের হাতেই দেওয়া হয়েছিল। তিনিই আবার মৃতদেহ দাহ করার অনুমতির জন্য সামরিক অফিসারকে দরখাস্ত করেছিলেন। এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন ডাঃ চিসুরুতা। যদি এই ডাক্তারের বক্তব্যকে গ্রহণ করা হয় তাহলে আর কোনো সংশয়ের অবকাশ ছিল না। কিন্তু যখন তাঁদের বক্তব্য ও ব্যুরোর দুই কর্মীর সাক্ষ্য-র চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় তার থেকে নতুন সত্য বেরিয়ে আসে তা হল—যদি নেতাজির মৃতদেহ দাহ করতে হয় তবে নিশ্চয়ই

Scanned by CamScanner

ওই তারিখে তিনি রামভবন ছেড়ে চলে যান। তবে তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে কোনো জোরালো তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় সেগুলি বিবেচনায় রাখা হয়নি। তবে গুমনামি বাবা নিয়ে তিনজন সাংবাদিক অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা হলেন— অশোক টেনডন, ড. বিশ্বম্ভর নাথ আরোরা এবং সৈয়দ কাউসের হুসেন যাঁরা গুমনামিবাবার রহস্যের উপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ সংবাদপত্রে, পত্রিকাতে ও গ্রন্থে। তাঁরা সকলেই কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ফৈজাবাদের এক বাসিন্দা ড. পি. ব্যানার্জী ১৯৭৪/১৯৭৫ সালে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পিতামাতার সঙ্গে অযোধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডের এক সাধুর আশ্রমে গিয়েছিলেন কেননা তাঁর বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সেই সাধু নেতাজি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না। প্রাথমিকভাবে তাঁদের সন্ন্যাসীকে দেখতে দেওয়া হয়নি, এমনিতে তিনি পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলতেন। তবে অনেক অনুরোধের পর সেই সাধু তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলেন। কথা বলার পর তাঁর পিতামাতা নিশ্চিত হন তিনিই নেতাজি। তবে তিনি নিজে যেহেতু বলেননি তাই এটাও প্রচলিত কাহিনি বলে খারিজ করা হয়। তাঁদের অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কমিশন জোরালো কোনো তথ্য পাননি।

কমিশন এর পর যাঁর সাক্ষ্য নেন তিনি হলেন রামকুমার শুক্লা যাঁর মা শ্রীমতী সরস্বতীদেবী শুক্লা ভগবানজির সেবিকা ছিলেন (তিনি তখন বেঁচে নেই) তাঁর সাক্ষ্য অনুযায়ী তাঁর মায়ের সঙ্গে ভগবানজির সাক্ষাৎ হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে লক্ষ্ণৌ-এর সিঙ্গারনগড়ে এবং তিনি রামভবনে নেতাজির সঙ্গে আমৃত্যু ছিলেন। প্রামাণ্য হিসেবে তিনি বলেন যে, ভগবানজির আস্তানায় ২৩ জানুয়ারি এবং দুর্গাপুজোর সময় কোলকাতা থেকে যারা আসতেন তাঁরা হলেন, শ্রীমতী লীলা রায়, অধ্যাপক সমর গুহ, ড. পবিত্রমোহন রায় এবং অমল রায়। তাঁরা ভগবানজির সঙ্গে কথা বলতেন পর্দার আড়ালে থেকে। মায়ের কাছ থেকেই তিনি জেনেছেন তিনিই আসল নেতাজি। তাঁর কাছে জোরালো তথ্য না থাকলেও আশ্রমে কোলকাতার বিশিষ্ট অতিথিদের আসাটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা ১৯৬৩-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ভগবানজি বা গুমনামি বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁরা হলেন সুনীল কৃষ্ণ গুপ্ত। তাঁর তথ্য অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে সুরেশ বোস (নেতাজির বড়দা) তাঁকে বলেছেন যে নেতাজি উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার নৈমিশরণ্যা-তে ছিলেন এবং সেখানকার মন্দিরে তিনি এক সাধুকে দেখেছেন। সাধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি সেখানে ১০ দিন ছিলেন। তখন থেকে তিনি ২৩ জানুয়ারি ও দুর্গাপুজার সময় আসতেন এবং কথা বলতেন। তিনি সাধুকে ভগবানজি বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর মতে, অন্য অতিথি যাঁরা সেখানে আসতেন তাঁরা হলেন ড. আর.পি. মিত্র, ড. পবিত্রমোহন রায় যিনি আজাদহিন্দ বাহিনীর গোয়েন্দা শাখায় ছিলেন, শিবপ্রসাদ নাগ ও অন্যান্যরা। তিনি এটাও বলেছেন যে ভগবানজির অনুরোধেই তিনি তাইহোকু-তে যান খোস্‌লা কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য। ভগবানজির সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হতো তিনি দিনপঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ করতেন।

এই ধরনের আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়— সরিজিৎ দাশগুপ্ত, জগৎজীৎ দাশগুপ্ত, তরুন কুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিজয়কুমার নাগ। তাঁরা স্বীকার করেছেন তাঁরা ১৯৪৫ সালের আগের নেতাজিকে দেখেননি। তবে ভগবানজির সঙ্গে কথা বলে তারা নিশ্চিত হয়েছেন।

শ্রী গুপ্তের মতোই তাঁরা নেতাজির সঙ্গে কথোপকথনের দিনপঞ্জিকা করতেন। শ্রী নাগ এমন কথাও বলেছেন যে ভগবানজি গল্প করার ভঙ্গিতে তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাহিনি বলতেন যা থেকে তিনি নিঃসন্দেহ হন তিনিই নেতাজি। এগুলির উপর ভিত্তি করেই তিনি লিখেছেন 'ওই মহামানব আসে' (দু'খণ্ড) তাঁর সম্পাদিত 'জয়শ্রী' নামক পত্রিকাতেও সেই সব ঘটনার বিবরণ আছে। আবার দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে, শ্রীকান্ত শর্মা এবং অপূর্ব চন্দ্র ঘোষদের মতো ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁরা প্রত্যেকেই ১৯৪৫ সালের আগের নেতাজিকে দেখেছেন এবং গুমনামি বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যেমন শ্রী পাণ্ডে বলেছেন যে তিনি গুমনামি বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৯৬৭ সালে, বাস্তিতে এবং তখন থেকে প্রায় নয় বছর ধরে তিনি প্রতি রাতে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতেন। শ্রী শর্মা দাবি করেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ১৯৬৩ সালে নৈমিশারণ্যে। শ্রী ঘোষ বলেছেন যে তিনি প্রথম নেতাজিকে দেখেন ঢাকায়, ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৫ সালের আগে কোলকাতায় এবং ১৯৬৫ সালে বাস্তীর্তে সাধুরূপে। তিনি আরও বলেছেন কথোপকথনকালে ভগবানজি/গুমনামি বাবা নেতাজির এলগিন রোডের বাড়ির বাহাদুরের খোঁজ নিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন সেখানে তাঁর ঘরের দেওয়ালে কালীর ছবিটা আজও আছে কি না।

শেষ পর্বের দু'দল সাক্ষীর জবানবন্দী না মানার কোনো আপাত কারণ নেই, যাঁরা নেতাজিকে ১৯৪৫ সালের আগে দেখেছেন এবং ভগবানজি/গুমনামি বাবার অনেকবার মুখোমুখি হয়েছেন, বিশেষ করে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যাদের ২৩ জানুয়ারি ও দুর্গাপূজার সময় সেখানে আসার বিষয়টিকে চিঠির সাহায্যে প্রমাণিত করা, যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সমর গুহ, ড. পবিত্র মোহন রায় এবং শ্রীমতী লীলা রায়ের রামভবনে যাবার স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও কমিশনের হাতে এমন তথ্যাদি এসেছে যা অবশ্য কমিশন প্রমাণ করতে পারেনি যে গুমনামি বাবাই নেতাজি। আবার রামভবন থেকে যে দাঁত পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির ডি.এন.এ. পরীক্ষা করে জানা যায় সেগুলিও নেতাজির নয়। সকল প্রামাণ্য বিচার করে কমিশন যে সিদ্ধান্ত জানায় তা হল—

ক) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মারা গেছেন;
খ) তিনি কোনো বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি, যেমন বলা হয়;
গ) জাপানের মন্দিরের চিতাভস্ম নেতাজির নয়;
ঘ) সমর্থনযোগ্য প্রামান্যের অভাবে কোনো ইতিবাচক উত্তর দেওয়া যায় না; এবং
ঙ) উত্তর ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে (উপরের 'ক')।

কিন্তু অনুজ ধর ও চন্দ্রচূড় ঘোষের দীর্ঘ পনেরো বছরের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে গুমনামি বাবাই নেতাজি। তাঁদের নিরলস যৌথ গবেষণাপত্রটি ২০১৯ সালে 'কোননড্রাম সুভাষ বোসেজ লাইফ আফটার ডেথ্' শিরোনামে প্রকাশ করে সটারমার্ক ও বিতস্তা প্রকাশনা। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে

Scanned by CamScanner

সরকারি তথ্য ও ফাইলের বিনির্মাণ করে তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে গুমনামি বাবাই আসলে নেতাজি। তাঁরা বলেছেন যে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নেতাজি বেঁচে থাকলেও তাঁর বয়স হতো ৮৮ বছর। যেটা সম্ভব। তাঁদের যৌথ গবেষণা এতদিনকার রাজনৈতিকভাবে নির্মিত নেতাজি মৃত্যু রহস্যের উন্মোচন করতে পেরেছে। তাঁরা নির্ভর করেছেন জাস্টিস মনোজকুমার মুখার্জী কমিশনের তথ্যের উপর। সেগুলিকে পড়েছেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের অন্তর্নিহিত রহস্যের উন্মোচন করেছেন। মুখার্জী কমিশনই প্রথম প্রমাণ করেন যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। গুমনামি বাবা যে সব চিঠি লিখেছিলেন তারই এক সহযোদ্ধা ড. পবিত্রমোহন রায়কে, স্বাধীনতা-সংগ্রামী লীলা রায়কে এবং অন্যান্য যাঁরা গুমনামি বাবার সান্নিধ্যে এসে অনেক পত্রিকায় লিখেছেন সেগুলি যে নেতাজির সঙ্গে কথোপকথন থেকে লেখা এবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেছে। অনেক আইনগত লড়াই করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে আজাদহিন্দ বাহিনী নিয়ে যে সবিস্তার তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তা বিনির্মাণ করলে প্রমাণ হয়ে যায় গুমনামি বাবাই নেতাজি। 'কোনানড্রাম' গ্রন্থটির আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে তা যেমন নেতাজি রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করবে, তেমনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেরও পুনর্নির্মাণ করতে পারবে।

তথ্যসূত্র :

১) জাস্টিস মনোজ কুমার মুখার্জী কমিশন (১৯৯৯-২০০৫)

২) চন্দ্রচূড় ঘোষ এবং অনুজ ধর, কোনানড্রাম : সুভাষ বোসে'জ লাইফ আফটার ডেথ'—সটারমার্ক এ্যান্ড বিতস্তা প্রকাশনা, ২০১৯

Scanned by CamScanner